

## শ্রদ্ধাঞ্জলি



# অগ্নিযুগের শহীদ ক্ষুদ্রিম

অজয় রায়

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্নিযুগের শহীদ। পুরো নাম ক্ষুদ্রিম বসু। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ ও মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া। জন্মেছিলেন ১৮৮৯ সালের ৩৩ ডিসেম্বর তারিখে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন হারিহরপুর গ্রামে। পর পর দু'পুত্র সন্তানের অকাল মৃত্যুর পর এই পুত্রলাভে জননী যৎপরোন্তি আনন্দ বিহুল হলেও ছিলেন সতত শক্তিশাস্ত্র ‘এই বুঝি আবারও সন্তানকে হারান’। ক্ষুদ্রিমারের ছিল তিনি বোন অপরূপা, সরোজিনী এবং ননীবালা। পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনায় মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া সন্তানের ওপর সকল লৌকিক দাবি পরিত্যাগ করে বড় মেয়ে অপরূপার কাছে এক মুঠো খুদের বিনিময়ে নবজাতক সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব তুলে দেন। খুদের বিনিময়ে কেনা বলে নবজাতকের নাম রাখা হল ক্ষুদ্রিম। এত কিছুর পরও কিন্তু ক্ষুদ্রিমারের অকাল মৃত্যু ঠেকান গেল না। মাত্র ১৮ বছর ৭ মাস ১০ দিন বয়সে ব্রিটিশের ফাঁসির দড়িতে তাকে মৃত্যু বরণ করতে হয়। অপরাধ ? সে কথায় পরে আসছি।

## ক্ষুদ্রিমারের বাল্যজীবন

মাত্র ছয় বছর বয়সে ক্ষুদ্রিম মাত্-পিতৃহারা হন। আগেই বলেছি যে মার কাছ থেকে ক্ষুদ্রিমারের প্রতিপালনের দায়িত্ব পান বড়বোন অপরূপা দেবী। তাঁর স্বামী অমৃতলাল রায় দাসপুর থানাধীন গ্রামের তাঁর নিজ বাড়িতে ক্ষুদ্রিম ও তার ছোড়ুদি ননীবালাকে নিয়ে যান। অমৃতলাল ছিলেন ঘাটাল দেয়ালী আদালতের একজন কর্মচারী। গ্রামেই পিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাঠশালাতে শুরু হয় বালক ক্ষুদ্রিমারের প্রাথমিক শিক্ষা। ঘাটাল থেকে বড়বোনের জামাই তমলুকে বদলী হয়ে এলে ক্ষুদ্রিমকেও চলে আসতে হয় এখানে। তাকে তমলুক হ্যামিল্টন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ১৯০১ সালে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়।

এ সময় বিপুরী অরবিন্দ ঘোষ (১৯০২) এবং নিরবেদিতা ঘোষ (১৯০৩) মেদিনীপুর শহরে এসে স্বাধীনতার লক্ষ্যে গুপ্ত সমিতি গঠন করে যান। জেলার যুব সমাজকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে এ ধরনের গুপ্ত সমিতিতে সম্পত্ত হতে তারা উদ্ব�ৃদ্ধ করেন। ক্ষুদ্রিমও এ ধরনের সমিতির কাজে জড়িয়ে পড়েন অত্যন্ত কালে। আবারও ভগিনীপতী ১৯০৪ সালে মেদিনীপুর শহরে বদলী হলে, ক্ষুদ্রিমও মেদিনীপুর শহরে এসে কলেজিয়েট ক্লালে ভর্তি হন। সে সময় তমলুকে কলেরা মহামারী আকার ধারণ করলে ক্ষুদ্রিম আর্ত মানবতার সেবায় আত্মনির্যাগ

করেছিলেন।

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়াকালীন সময়ই তিনি ভালভাবে বিপুরী সত্যেন বাবুর কাছে বিপুর মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শুরু হয় শারীরিক ব্যায়ামচর্চা, লাঠিখেলা, দ্রুত এক স্থান থেকে অন্যত্র চলে যেতে রণপা'র ব্যবহার শিক্ষা। বালক ক্ষুদ্রিমামের জীবনে এল ব্যাপক পরিবর্তন— দেশের স্বাধীনতা অর্জনের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এক সৈনিক। এ সময়ই সত্যেন সেনের নির্দেশে কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কিংসফোর্ডকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এবং এ কাজে ক্ষুদ্রিমামকে অন্যতম সদস্য হিসেবে ঘাতক দলে (killing squad) নির্বাচন করা হয়।

এখানে একটু ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টানো যাক। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই মেদিনীপুর জেলা শহরে শশস্ত্র অভিযানের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ বন্দীদশা থেকে ভারতকে মুক্ত করতে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজনারায়ণ বসুর আত্মস্ফূর্তি জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্র নাথ বসু এবং হেমচন্দ্র কানুনগো ছিলেন এই বিপুরী কর্মজ্ঞের পুরোহিত। পেশায় জ্ঞানেন্দ্র ও হেমচন্দ্র ছিলেন স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক, আর সত্যেন বসু ছিলেন জেলা কালেক্টর অফিসের একজন কর্মচারী।

কিন্তু হঠাতেই কিংসফোর্ডকে কোলকাতা থেকে মজ়ঘফরপুরে বদলি করা হয় ১৯০৮ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে। নতুন স্থান পরিদর্শনের জন্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্য (রেকি) পথমে প্রফুল্ল চাকী ও সুশীল সেনকে পাঠান হয়। কিন্তু বাবার কঠিন অসুখের খবরে সুশীল কোলকাতায় ফিরে আসে। কোলকাতার বিপুরী নেতা হেমচন্দ্র দাস পরে ক্ষুদ্রিমামকে এ কাজে নিয়োগ করেন। ক্ষুদ্রিম ২৯শে এপ্রিল মজ়ঘফরপুরে প্রফুল্ল চাকীর সাথে মিলিত হন বলে জানা যায়। প্রফুল্ল চাকীর আসল নাম দীনেশ চন্দ্র রায়, রংপুরের ছেলে। এরা দু'জনে ১৯০৮ সালে ১৭-১৮ এপ্রিল তারিখে এক ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছিল। এ ব্যাপারেও সাহায্য করেছিলেন কিশোরীমোহন বন্দোপাধ্যায়। জানা যায় যে, কোলকাতা থেকে এই ধর্মশালার ঠিকানাতেই দীনেশের নামে কুড়ি টাকা মনি অর্ডার-যোগে পাঠান হয়েছিল। দীনেশ এ টাকা পোস্ট অফিস মারফৎ পেয়ে যান, সম্ভবতঃ কিশোরীমোহনের মধ্যস্থতায়।

শুরু হয় কিংসফোর্ডের গতিবিধির ওপর নজর। আদালতে যাওয়া আসার পথে সদা সর্বদা নজর ও সুযোগ মত বোমা মেরে কার্য সাধনের চেষ্টা। কিন্তু

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়াকালীন সময়ই তিনি ভালভাবে বিপুরী সত্যেন বাবুর কাছে বিপুর মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শুরু হয় শারীরিক ব্যায়ামচর্চা, লাঠিখেলা, দ্রুত এক স্থান থেকে অন্যত্র চলে যেতে রণপা'র ব্যবহার শিক্ষা। বালক ক্ষুদ্রিমামের জীবনে এল ব্যাপক পরিবর্তন— দেশের স্বাধীনতা অর্জনের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এক সৈনিক। এ সময়ই সত্যেন সেনের নির্দেশে কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কিংসফোর্ডকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এবং এ কাজে ক্ষুদ্রিমামকে অন্যতম সদস্য হিসেবে ঘাতক দলে (killing squad) নির্বাচন করা হয়।

দিনের পর দিনেও এই সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছিল না। আদালতের এজলাসেই মারার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও পরিত্যাগ করা হল এ কারণে যে এতে অনেকে নিরীহ প্রাণ মারা যাবে। দেখা গেল যে সন্ধ্যার দিকে জজ সাহেব স্থানীয় ইউরোপীয় ক্লাবে যান। পরিকল্পনা হলো যে একদিন রাতে ফেরার পথে জজ সাহেবের ওপর বোমা হামলা চালান হবে। দিন স্থির হলো ৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮। কিন্তু কিংসফোর্ড যে ধরনের ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার করেন ঠিক অনুরূপ আর একটি গাড়ীতে ক্লাব থেকে ঐ দিন রাত সাড়ে আটটার দিকে জনৈক স্থানীয় বড় ইংরেজ উকিল কেনেডির পাছী ও কন্যা ফিরেছিলেন। এর অল্প পেছন পেছন আসছিল কিংসফোর্ডের গাড়ীও। কেনেডিদের গাড়ী যখন কিংসফোর্ডের বাসার গেটের কাছে উপনীত হলে গোপনে লুকায়িত ক্ষুদ্রিম ঐ গাড়ীটিকে জজ সাহেবের গাড়ী মনে করে সজোরে বোমা নিক্ষেপ করে। প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফেরিত হলে, গাড়ীটি চুরমার হয়ে যায় এবং শ্রীমতী কেনেডি ও তদীয় কন্যা কুমারী কেনেডি তৎক্ষণাত মৃত্যু মুখে পতিত হন। গাড়ী চিনতে না পারার কারণে অকালে দু'জন নির্দেশ ইংরেজ ললনাকে প্রাণ দিতে হল।

### প্রফুল্ল চাকীর আত্মনিবেদন

সময় থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরামের এ কাজকে অবিমৃষ্যকারিতা বলে চিহ্নিত করা যেতেই পারে। এমন কি প্রশ্নও তোলা যেতে পারে এতে স্বাধীনতা অর্জনের পথ কর্তৃ এগিয়েছিল। তবে তত্ত্বগত প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় ক্ষুদিরামসহ অগ্নিযুগের এই যুবসমাজের আত্মত্যাগ স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার জন্য সাধারণ মানুষকে নিঃসন্দেহে উদ্বৃত্ত করেছিল যা কংগ্রেসকে স্বাধীনতা আদায়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছিল এতে কোন দ্বিধা নেই। বোমা বিফোরণের পরপরই প্রফুল্ল চাকী রেল লাইন ধরে ছুটতে ছুটতে অবশেষে ওয়েস্টার্ন রেলের সমন্ত্বিত স্টেশনে পৌছে মোকাম ঘাটের টিকিট কেনেন, কিন্তু সে নন্দলাল নামক এক দারোগার সদেহভাজন নজরে পড়ে ও প্রফুল্লর সাথে একই কামরায় উঠে তার সাথে আলাপ জমানোর চেষ্টা করে। এই দারোগাই অবশেষে পরবর্তী মোকাম ঘাটে জংশনে প্রফুল্লকে ধরে ফেলে। প্রফুল্ল চাকী ওরফে দীনেশ রায় উপায়ন্তর না দেখে নিজেকে গুলির আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করে আত্মহতি দিলেন স্বাধীনতার বেদীযুলে (১লা মে, ১৯০৮)। মৃত্যুর আগে দীনেশ নাকি ওই বাঙালী পুলিশ কর্মকর্তাকে উদ্দেশ্য করে শেষ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, “বাঙালী হয়ে এই কাজটি করলেন”। দীনেশের মৃতদেহ কোলকাতায় আনা হয়,

সময় থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে  
ক্ষুদিরামের এ কাজকে অবিমৃষ্যকারিতা  
বলে চিহ্নিত করা যেতেই পারে। এমন  
কি প্রশ্নও তোলা যেতে পারে এতে  
স্বাধীনতা অর্জনের পথ কর্তৃ  
এগিয়েছিল। তবে তত্ত্বগত প্রশ্ন না তুলেও  
বলা যায় ক্ষুদিরামসহ অগ্নিযুগের এই  
যুবসমাজের আত্মত্যাগ স্বাধীনতা  
সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার জন্য সাধারণ  
মানুষকে নিঃসন্দেহে উদ্বৃত্ত করেছিল যা  
কংগ্রেসকে স্বাধীনতা আদায়ে ব্রিটিশ  
বিরোধী সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে সাহায্য  
করেছিল এতে কোন দ্বিধা নেই।

এবং নিশ্চিতভাবে তাকে রংপুরের প্রফুল্ল চাকী বলে পুলিশ সন্মান করে। এ ভাবেই অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত এক তরুণ প্রাণ বলি দিল দেশের স্বাধীনতার জন্য। বাঙালী তাকে দিল শহীদের মর্যাদা। তার আর দুজন শহীদের নামে কোলকাতার ডালহোসী ক্ষয়ারের নাম রাখা হয়েছে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ বা সংক্ষেপে ‘বিবিডি বাগ’।

প্রফুল্ল চাকী ওরফে দীনেশ চন্দ্র রায় ছিলেন রংপুর সরকারী জেলা স্কুলের ছাত্র। শহরে রাস্তায় মিছিলে ‘বন্দে মাতরম’ গান গাওয়ার অপরাধে তাঁকে স্কুল থেকে বিতাড়ি করা হয়। পরে তিনি অবশ্য স্থানীয় একটি বেসরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে প্রবেশিকা পরিষ্কায় উজ্জীর্ণ হন। অতঃপর কোলকাতায় এসে ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এ সময় তিনি থাকতেন মানিকতলা বাগানে এবং সেখানকার বিপুলবাদের সংস্পর্শে আসেন। তিনি শহীদ হলে তাঁর স্মরণে বেশ কিছু গান ও কবিতা রচিত হয়েছিল সে সময়, যেগুলো তখনকার তরুণদের উদ্বৃত্ত করতো। এর একটি নমুনা তুলে ধরা যাক :

“আজিও তোমাকে ভুলিতে পারিনি

বীর প্রফুল্ল চাকী,

.....

তব পবিত্র সুকর্তোর দেহ

স্পর্শিতে কভু পারে নাই কেহ

নিজ হাতে দিলে পরাণ আহুতি

বন্ধন-লাজ ঢাকি ।

### ক্ষুদিরামের পরিণতি

অন্যদিকে ৩০শে মে রাতে ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে গিয়ে এক রাতে বেঙ্গল-নর্থ ওয়েস্ট রেল লাইন ধরে ২৪ মাইল পথ অতিক্রম করে পৌঁছে যান ওয়াইন স্টেশনে ৩১শে মে সকাল আটটা নাগাদ। পথশ্রমে ক্লাস্ট ও ক্ষুধার্ত ক্ষুদিরাম স্টেশনের পাশেই মুড়ি কিনে খাওয়া অবস্থায় পুলিশ সন্দেহ বশতঃ তাকে গ্রেঞ্জার করে।

সাথে সাথেই খবর চলে গেল কোলকাতার পুলিশ হেড কোয়ার্টারে, সেখান থেকে নির্দেশ গেল বিহার পুলিশ দণ্ডের ক্ষুদিরামের বজ্ব্য যেন যাচাই বাছাই করা হয় কড়া পাহাড়ার মধ্যে। কোন ক্রমেই যেন সে পালাতে না

পারে। তাকে সার্চ করে পাওয়া গেল ৩৭টি টোটা সহ দুটি রিভলবার এবং নগদ সাইক্লিশ টাকার মত। ছিল ভারতীয় রেলপথের একটি মানচিত্র ও এটি রেলের টাইম টেবিল। দীনেশের মতই ক্ষুদ্রিম ধরা পড়ার সাথে সাথেই রিভলবার বের করে নিজেকে গুলি করার চেষ্টা নিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশি অতি তৎপরতায় সফল হন নি। পুলিশ তার হাত চেপে ধরায় ফায়ার করতে পারেন নি।

সে দিনই বিকেলের ট্রেনে তাঁকে মজ়ঘরপুর নিয়ে যাওয়া হয়। সারাটি সময় কোন কথা বলেন নি। তবে ট্রেন থেকে থানায় নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে পুলিশের গাড়ীতে ওঠার আগে উচ্চাঞ্চলে একবার মাত্র ধ্বনি দিয়েছিলেন, ‘বন্দে মাতরম’, মাত্র একবার। ১৯০৮ সালে ২৫শে মে মামলা দায়ের করা হয় আদালতে, আর বিচার কার্য শুরু হয়েছিল ৮ই জুনে। সারা বিচার কাজের সময় ছিলেন নির্ভয় ও অবিচল। বিচারকের প্রশ্নের জবাবে নিরাপরাধ দু’জন ইংরেজ রমনীর মৃত্যুর অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। নির্বিকার চিত্তে এই সাহসী দেশ মাতৃকার সেবায় নিবেদিত এই যুবকটি ১৩ই জুনে ঘোষিত তার ফাঁসির রায় নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন, অকম্পিত হন্দয়ে। রায় শোনার পর নাকি তিনি বলেছিলেন, ‘গীতা পাঠ করার ফলে তিনি মৃত্যুভয় জয় করেছিলেন, কারণ আত্মার মৃত্যু হয় না, জীর্ণ কাপড়ের ন্যায় দেহের বদল হয় মাত্র।

এই ফাসীর রায়কে সুনিশ্চিত করা হয় উচ্চ আদালতে

১৯০৮ সালে ২৫শে মে মামলা দায়ের  
করা হয় আদালতে, আর বিচার কার্য শুরু  
হয়েছিল ৮ই জুনে। সারা বিচার কাজের  
সময় ছিলেন নির্ভয় ও অবিচল।

বিচারকের প্রশ্নের জবাবে নিরাপরাধ  
দু’জন ইংরেজ রমনীর মৃত্যুর অপরাধ  
স্বীকার করেছিলেন। নির্বিকার চিত্তে এই  
সাহসী দেশ মাতৃকার সেবায় নিবেদিত  
এই যুবকটি ১৩ই জুনে ঘোষিত তার  
ফাঁসির রায় নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ  
করেছিলেন, অকম্পিত হন্দয়ে।

১৯০৮ সালের ১১ই জুলাই তারিখে, ঠিক একমাস পরে। আর ১১ আগস্ট তারিখে (১৯০৮) এই রায় কার্যকর হয়। এ ভাবেই বাংলার বীর যুবক মজ়ঘরপুর জেলে ফাঁসীর দড়িতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন প্রথম শহীদের মর্যাদা নিয়ে। বাংলার মানুষ যুগ্মগ ধরে এই শহীদকে স্মরণে রেখে অমরত্ব প্রদান করেছে। দেশের মানুষ নানাভাবে তাকে মনে রেখেছে। গানে কবিতায়। আজও লোকে চারণের মত পথে ঘাট সভা সমিতিতে তাঁকে স্মরণ করে চলছে। চারণ কবি মুকুন্দ দাসের সেই অনবদ্য গান-

“বিদায় দে মা, একবার ঘুরে আসি।

ত্রিশ দিন পরে মাগো জন্ম নেব মাসীর ঘরে,

তখন যদি চিনতে না পারিস মা,

দেখবি গলায় ফাঁসী,

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি ॥”

তার আগে বা পরে দেশ প্রেমিকের মরণে এত গান কখনও রচিত হয় নি। যেমন আর একটি গানে বলা হচ্ছে :

“ক্ষুদ্রিম তুমি দিয়েছিলে প্রাণ

বাঙ্গালারে ভালবাসি।

হাসিতে হাসিতে মরণ মধ্যে

গলায় পরিলে ফাঁসি ।”

অথবা,

“তোরা নয়রে ছেট নয়রে কম।

একবার তোরা ফিরে দাঁড়া,

তুলে নে মার বলির ধাঁধা,

ছুটবে তোদের মনের ধাঁধা,

বুঝাবি নিজের পরাক্রম।”

এ রকম কত শত শত গান-কবিতা রচিত হয়েছিল তাঁকে স্মরণ করে, জাতিকে উদ্বৃত্তি করার লক্ষ্যে। ২০০৮ সালের ১১ই আগস্ট পূর্ণ হয়েছে ক্ষুদ্রিম বসু আর দীনেশ চন্দ্র রায়ের দেশমাতৃকার চরণে আত্মোৎসর্গের শতবর্ষপূর্তি। আমরা মুক্তান্বেষ্যার পক্ষ থেকে এই দুই শহীদের প্রতি নিবেদন করছি অস্তরের শুদ্ধাঞ্জলি।

মুক্তাবেষা

সংযুক্তিৎ উচ্চ আদালতে ফাঁসির রায়ের অনুলিপি

No. 2823 Cr

***In the High Court of Judicature at Fort William in Bengal***

CRIMINAL JURISDICTION

Present

THE HON'BLE MR. JUSTICE .....xx

AND

THE HON'BLE MR. JUSTICE .....xx

THE EMPEROR

versus

Khudiram Bose ... ... Accused.

Upon Reading letter No. 1646, dated 13th of June, 1908 from the session's Judge of Mozaaffar pore referring for confirmation the sentence of DEATH passed by the Court of Mozaffar pore upon the said accused Khudiram Bose son of Trailakhyanath Bose on the 13th of June, 1908 and the proceedings of the said Court of Session on the trial of the said accused Khudiram Bose and after consideration of his appeal, - IT IS ORDERED that the said appeal be and the same is hereby dismissed, and the sentence of DEATH passed on the said accused Khudiram Bose be and the same is hereby confirmed.

DATED this 13th day of July in the year of Our Lord One Thousand Nine Hundred and Eight.

Signed and sealed by order of the High Court.

Sd/ Illegible